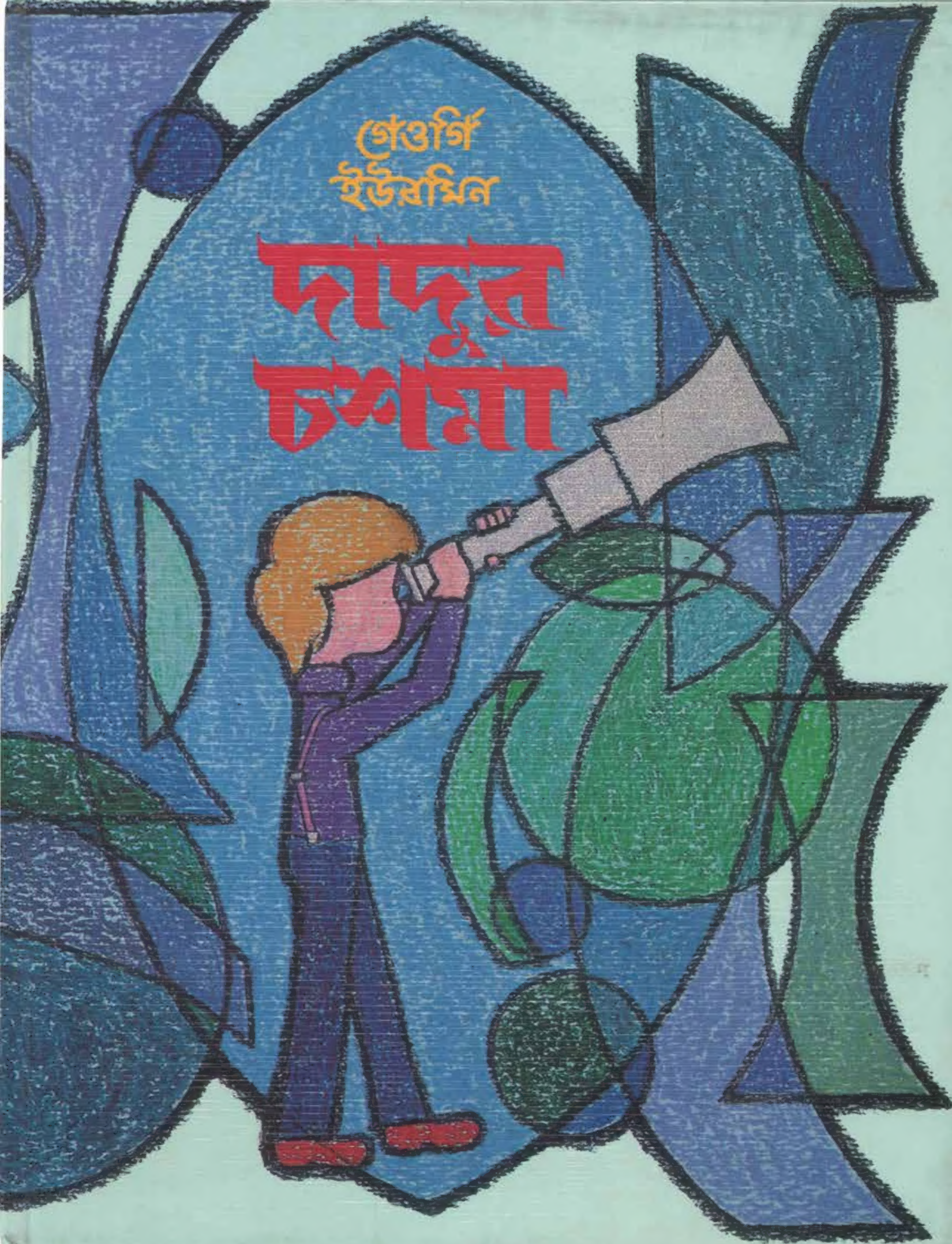


গেওর্গি
ইউরম্বিন

দাদু চখামা



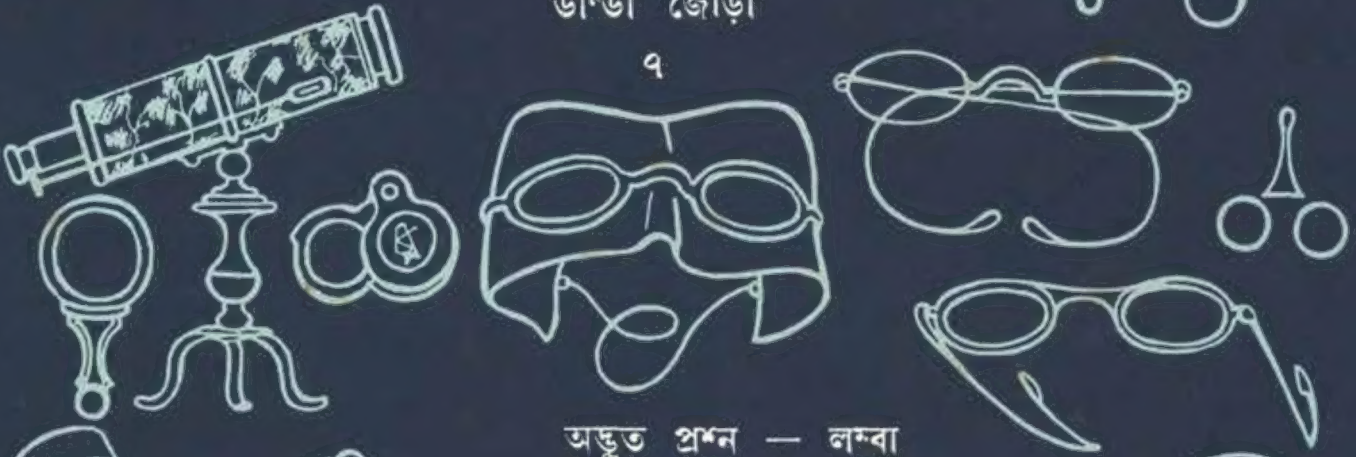
সাঁচ
দাদুর চোখ
কোথায় গেল

৫



দুই কানে দুই
ডাঙা জোড়া

৭



অদ্ভুত প্রশ্ন — লম্বা
নাকে কী কাজ?

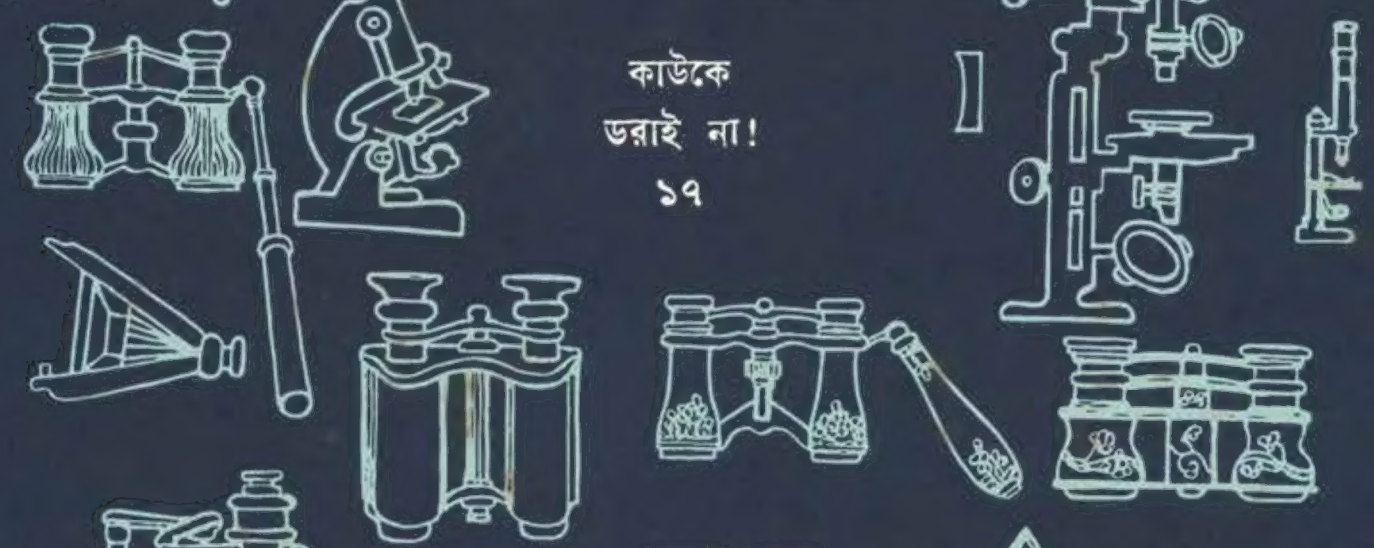
৯



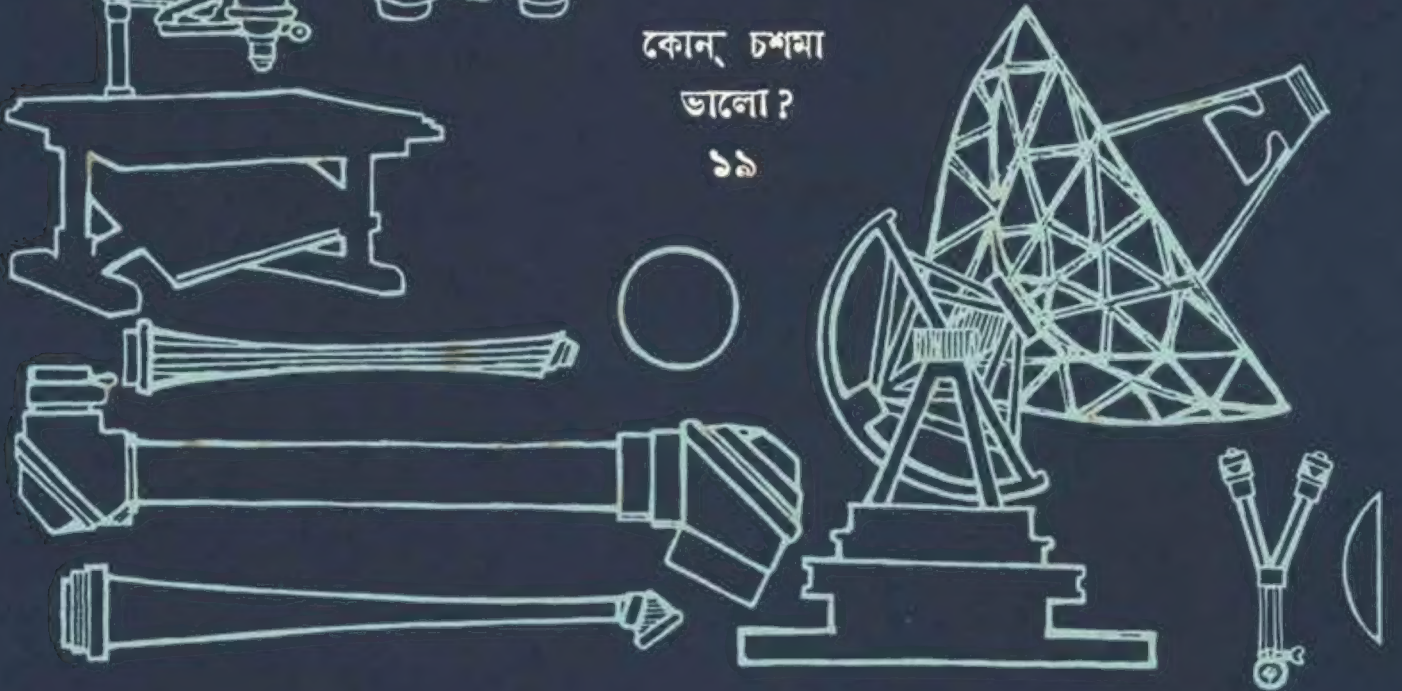
কেবল কেন
আর কেন?
১৩



কাউকে
ডরাই না!
১৭



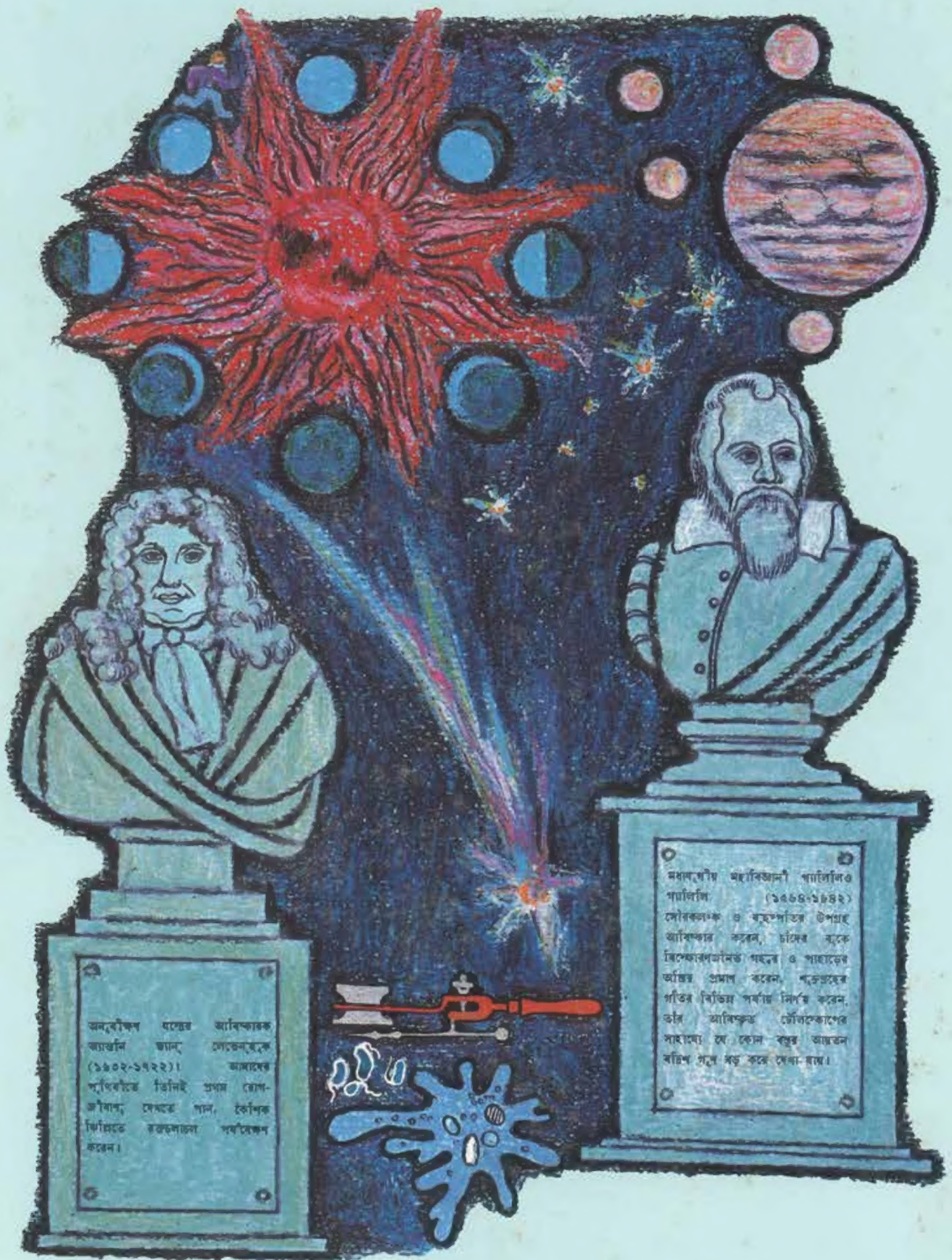
কোন চশমা
ভালো?
১৯







THE UNIVERSITY OF
THE SOUTH PACIFIC
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION
SUVA, FIJI



অন্যদিক যন্ত্রের আবিষ্কারক
ক্যাপ্তান জ্যাক লেভেলর
(১৬০২-১৭২২)।
আমাদের
পৃথিবীতে তিনিই প্রথম রোগ-
জীবাণু দেখতে পান, কৌশল
বিদ্যাতে রক্তচাপের পৰ্যবেক্ষণ
করেন।

মহাশয়ী অরবিজানী গ্যালিলিও
গ্যালিলি (১৫৬৪-১৬৪২)
সৌরকেন্দ্রিক ও ব্রহ্মসংসার উপগ্রহ
আবিষ্কার করেন, চাঁদের বুকে
বিশ্লেষণযোগ্য গহবর ও পাহাড়ের
অস্তিত্ব প্রমাণ করেন, শব্দতরঙ্গের
গতির বিভিন্ন পর্যায় নির্ণয় করেন,
তার আবিষ্কৃত টেলিস্কোপের
সাহায্যে যে কোন বস্তু আরও
বড়দিন গুলে বড় করে দেখা যায়।

গেওর্গি
ইউরমিন

দাদুর চশমা

ছবি এঁকেছেন
ইরিনা কিসেলেভ্‌স্কায়া



‘রাডুগা’ প্রকাশন • মস্কো



দাদুর চোখ কোথায় গেল

আমার দাদু আছেন। দাদুর চুল সাদা ধবধবে।

আমি জিজ্ঞেস করি:

‘তোমার চুল অমন কেন?’

‘বয়সে পাক ধরেছে।’

দাদুর পিঠ নুইয়ে পড়েছে।

‘তোমার পিঠ অমন কেন?’

‘বয়সে কুঁজো হয়ে গেছে।’

আমার দাদুর চোখজোড়া ভালোমানুষ-ভালোমানুষ, আর তার চারপাশে সরু সরু জালের মতো রেখা। এটাও হয়ত বয়সে হয়েছে। আর সেই চোখের ওপর সব সময় ঝকঝকে ফ্রেমের চশমা।

আমি জিজ্ঞেস করি:

‘দাদু, তোমার চশমা কেন?’

রেড রাইডিং হুডকে নেকড়ে যে ভাবে বলে, দাদু হুবহু সেই রকম হেঁড়ে গলায় আমাকে উত্তর দেন:

‘তোকে যাতে ভালো করে দেখা যায়। বয়সে চোখদুটোর দফা রফা হয়ে গেছে কিনা!’

এক দিন দাদু বললেন:

‘আচ্ছা আমার চোখ গেল কোথায় বলতে পারিস?’

আমি ত অবাক: চোখ আবার হারাবে কী করে?

দাদু হেসে বললেন:

‘আরে না, আমি বলছি চশমার কথা। চশমা আমার চোখের বদলি কিনা।’

দাদুর হারানো জিনিস আমি সর্বত্র খুঁজতে লাগলাম। তারপর দাদুর দিকে তাকিয়ে দেখি — আরে চশমা ত ওঁর নাকের ডগায়ই ঝুলছে!

‘দেখালি কাঁডখানা!’ দাদু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ‘দেখা যাচ্ছে বয়সে স্মৃতিশক্তিও ক্ষয়ে গেছে।’

আরেকবার কিন্তু চশমা সত্যি সত্যিই হারিয়ে গেল। সর্বত্র তন্নতন্ন করে খুঁজলাম — না, কোথাও নেই: না আছে টেবিলের ওপর, না টেবিলের নীচে, না তাকে। এমন কি নাকের ডগায়ও নেই। বেমালুম হাওয়া হয়ে গেছে।

‘দাদু, এখন তাহলে তুমি তোমার খবরের কাগজ পড়বে কী করে?’

‘তোমার দাদুর চশমাটা পরে চেষ্টা করে দেখব।’

দাদু তা-ই করলেন। কিন্তু সে চশমায় তাঁর কাজ হল না, চোখে আরও খারাপ দখতে লাগলেন। তার কারণ হল এই যে একেক লোকের চোখে দেখার ক্ষমতা একেক রকম, আর চশমার কাচও প্রত্যেকের আলাদা আলাদা, বিশেষ ধরনের। দাদুর চোখের পক্ষে যে চশমা একদম ঠিক, দাদুর তা কাজে লাগে না। আবার এর উল্টোটাও বলা যায়।

‘দাদু, এখন তাহলে তুমি তোমার খবরের কাগজ পড়বে কী করে?’

‘তা বটে, হারানো জিনিসটা যতক্ষণ পাওয়া না যাচ্ছে ততক্ষণ একটা চালানি খাটাতে হবে আর কি! সেকালে লোকে যা করত তা-ই করতে হবে।’

‘কী রকম?’

‘এই এরকম আর কি।’

বলেই দাদু হাতলওয়ালা ফ্রেমে বাঁধানো একটা আতস কাচ হাতে নিয়ে খবরের কাগজের লাইনগুলির ওপর দিয়ে বুলিয়ে চললেন।

আতস কাচ ছাড়া একেকটা অক্ষর দেখাচ্ছিল ছোট্ট একরান্না মাছির মতন, আর আতস কাচ দিয়ে প্রত্যেকটি হল প্রায় দেশলাইয়ের বাক্সের সমান পেলাই।

‘ওঃ, মোটেই সুবিধের নয়!’ বাঁ চোখ কুঁচকে হাত দিয়ে অনবরত লাইনের ওপর দিয়ে আতস কাচ ঘোরাতে ঘোরাতে দাদু বললেন। ‘আমার সত্যিকারের চশমা যত তাড়াতাড়ি খুঁজে পাওয়া যায় ততই ভালো।’

দাদু বেচারির কণ্ঠ দেখে আমার খারাপ লাগছিল। আমি তাই আবার চশমা খোঁজার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলাম।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য পাওয়া গেল। দাদুর বইয়ের ভেতরে দুটো পৃষ্ঠার মাঝখানে লুকিয়ে ছিল। হতচ্ছাড়া চশমা টু শব্দটি না করে ওখানে পড়ে আছে। ভাবটা এমন যেন খোঁজা হচ্ছে ওকে নয় — অন্য কাউকে।

‘এই যে তোমার চশমা, দাদু!’



দুই কানে দুই ডাঙা জোড়া

‘ওঃ, আবার এক ফেসাদ হল রে: আমার চাকার ডাঙা জোড়া ভেঙ্গে গেছে,’ দাদু অনুযোগ করে বললেন।

আমি প্রথমে অবাক হয়ে গেলাম: ডাঙা মানে? কিসের চাকার? কিন্তু তারপর দাদুর ধাঁধার কথা মনে পড়ে যেতে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম।

ধাঁধাটা এই রকম:

দুই কানে দুই ডাঙা জোড়া,
একেক চোখে একেক চাকা,
নাকের ওপর বসার আসন।
এইটে কেমন ধরন ধারণ?

আন্দাজ করতে পারলে?

আমিও সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেললাম, চোঁচিয়ে বললাম:
‘চশমা! চশমা!’

হ্যাঁ, কানের সঙ্গে আঁটা এই বাঁকানো ডাঙাদুটোই গেছে ভেঙ্গে। তাই দাদুর নাক থেকে কাচের চাকাজোড়া থেকে থেকে পড়ে যাচ্ছে।

‘এখন কী উপায়?’

‘ঘাবড়ানোর কিছু নেই,’ দাদু আমাকে সাবুনা দিয়ে বললেন, ‘মেরামতের দোকানে নিয়ে যেতে হবে, সেখানে সারিয়ে দেবে। আর আপাতত এসো, সেই সেকালের মতো করা যাক।’

দাদু চশমার একেকটি চাকায় একটি করে ফিতে বাঁধলেন, চশমাজোড়া নাকে এঁটে ফিতেদুটো মাথার পেছন দিকে ফুল করে বেঁধে নিয়ে ব্যাপারটা মেন কিছুই না এমন ভাব করে খবরের কাগজ পড়তে লেগে গেলেন।

‘সেকালে কি এই ভাবে চশমা আঁটত নাকি?’ দাদুর মাথার পেছন দিকে বাঁধা ফিতের ডগাদুটো তারিফ করে দেখতে দেখতে একঘেষে লাগায় শেষকালে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

‘একেবারে যে এরকম তা নয়, তবে অনেকটা। ‘আসন’ সমেত দুটো কাচই বাঁধা থাকত টুঁপির সঙ্গে। টুঁপিসুদ্ধই ওটাকে পরতে হত। আবার এমনও হত যে কাচদুটোকে চামড়ার ফিতেতে এঁটে বসিয়ে দিয়ে ফিতেটাকে লোকে মাথায় জড়িয়ে বাঁধত। এ ব্যাপারটি প্রথম মাথায় খেলে এক রাজবৈদ্যর। রাজসিক নাক থেকে

চশমা অনবরত পড়ে যেতে থাকায় রাজামশাইয়ের দারুণ রাগ হত। তিনি এখন মহা খুশি হয়ে রাজবৈদ্যকে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন। আর ডাঙার যখন মারা গেলেন তখন রাজার হুকুমে তাঁর স্মৃতিস্তম্ভের ওপর সোনার অক্ষরে লেখা হল এই কথাগুলো: ‘এইখানে চিরনিদ্রায় শায়িত রহিয়াছেন চশমার উদ্ভাবক সার্গাভনো আর্মারিতি। ঈশ্বর তাঁহার দোষ ক্ষমা করুন!’

এই ঘটনাটা আমাকে বলে দাদু আবার খবরের কাগজে মাথা গুঁজলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ তিনি পড়লেন না, ‘রাজসিক ভঙ্গিতে’ বেশিক্ষণ চশমা নাকে রাখতে পারলেন না। থেকে থেকে ফিতে পড়ে যাওয়ায় তা ঠিক করতে করতে এবং ফিতের অবাধ্য বাঁধন অনবরত সামলাতে সামলাতে তিনি বিরক্ত হয়ে গেলেন। দশবারের বার ফিতের বাঁধন খুলে যেতে চশমা যখন পড়ে গেল তখন দাদু আর সহ্য করতে পারলেন না:

‘না, আর দেরি না করে মেরামতের দোকানে যেতে হয় দেখাছি। নইলে ভেঙ্গেই যাবে।’

এখন দাদুর দুই কানে আবার দুই ডাঙা জোড়া, চশমাও আর খুলে পড়ে না।





অদ্ভুত প্রশ্ন-লম্বা নাকে কী কাজ ?

আশ্চর্য ব্যাপার: এই গতকালই আমার বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর, আর আজ কিনা হয়ে গেল ছয়! মাত্র একদিন — এই এক দিনেই আমার বয়স বেড়ে গেল পুরো একটা বছর।

তার কারণ এই যে আজ আমার জন্মদিন। তোফা! সবাই আমাকে উপহার দিচ্ছে।

মা কিনে দিয়েছেন আঁকার খাতা আর রং। বাবা দিয়েছেন বল আর গল্পের বই। একমাত্র দাদুই কিছু কেনেন নি। দাদু তাঁর বাস হাতড়ে বার করলেন দূরবীন — অনেক অনেক কাল আগে কোন এক সময় তাঁর বাবা তাঁকে ওটা উপহার দিয়েছিলেন। যন্ত্রটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন:

‘নে, ব্যবহার কর। আমার চশমা এখন তোর কাজে লাগবে।’

‘কী যে বলব তোমাকে দাদু! আচ্ছা, তুমি ‘চশমা’ বললে কেন? ওটা ত দূরবীন।’

‘ওটাকে দূরবীন ত আর সাথে বলা হয় না! চশমার মতো এটা দিয়েও মানুষের চোখে দেখার ক্ষমতা বাড়ে, মানুষ দূরের জিনিস দেখতে পায় — তাই এর নাম দূরবীন। আরও একটা কথা। অতি সাধারণ চশমা যদি না থাকত তা হলে পৃথিবীতে দূরবীনও হত না।’

এর পর দাদু আমাকে এই ঘটনাটি বললেন।

বহুকাল আগে এক কাচের জিনিসের কারিগর ছিল। একবার সে একটা আতস কাচ নিয়ে তার ভেতর দিয়ে মাছের পা নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগল। দেখে, তার সামনে যা আছে তা ত কোন সরু ফির্নফিনে ঠ্যাঙ নয়, যেন একটা কাঠের গুঁড়ি।

মাত্র একটা কাচেই এরকম আজব ব্যাপার! আর যদি দুটো বা তিনটে নেওয়া যায়? তাতে নিশ্চয়ই আরও বহুগুণ বড় দেখাবে।

পরখ করে দেখল — তাই বটে।

সবই ত বেশ হল, কিন্তু কাচ হাতে ধরে রাখা ত অসুবিধাজনক। দূর পরত কিংবা তিন পরতের চশমা করতে পারলে হত, তা হলে কাজের জন্য হাত খালি রাখা যায়। কিন্তু সবগুলো কাচ যাতে লাগির আগায়

চড়াইয়ের মতো বসতে পারে এমন লম্বা নাক পাওয়া যায় কোথায়?

‘লম্বা নাক ছাড়াই কাজ চালাতে হবে,’ কারিগর মনে মনে ঠিক করল। ‘কিন্তু কী ভাবে?’

ভাবতে ভাবতে শেষকালে উপায় বার করল। তার কার্ফিসিদ্ধি করল ধাতুর একটা লম্বা চোঙ। চোঙটার ভেতরে কাচের টুকরোগুলো এমন চমৎকার ভাবে আটকে রইল যে নাকেও এমন থাকে না।

এই ভাবে পৃথিবীতে দেখা দিল দূরবীন, যাকে সেকালে বলা হত দেখার চোঙ।

যন্ত্রটা সঙ্গে সঙ্গে নাবিকদের মনে ধরল। তারা দূর দূর সমুদ্রযাত্রায় ওটা সঙ্গে নিয়ে চলতে থাকে। দূরবীন দিয়ে সমুদ্র ভালোমতো নিরীক্ষণ করা যায় — অনেক দূর চোখে পড়ে।

নাবিক দূরবীন চোখে দিয়ে থেকে থেকে হাঁক ছাড়ে: ‘বাঁয়ে জাহাজ! সামনে ডাঙা!’

‘তুইও তোর দূরবীন চোখে দিয়ে দ্যাখ আর নাবিক যেমন তার ক্যাপ্টেনকে বলে তেমনি যা যা দেখতে পাচ্ছিস আমাকে জানা,’ দাদু বললেন।

আমিও দেখতে থাকি। আর জানলা দিয়ে দেখার মতো কিছু একটা চোখে পড়ামাত্র দাদুকে চোঁচিয়ে বলি: ‘বাঁ দিকে এরোপ্লেন উড়ছে! সামনে গাছের ওপর একটা চড়াই পাখি ডালে ঘষে ঠোঁট পরিষ্কার করছে!’

চমৎকার আমার এই দূরবীন যন্ত্রটা! কী দারুণ ওর চোখ! কিন্তু দাদু যেই টেলিস্কোপের কথা বললেন তার সঙ্গে কি আর তাই বলে তুলনা চলে!

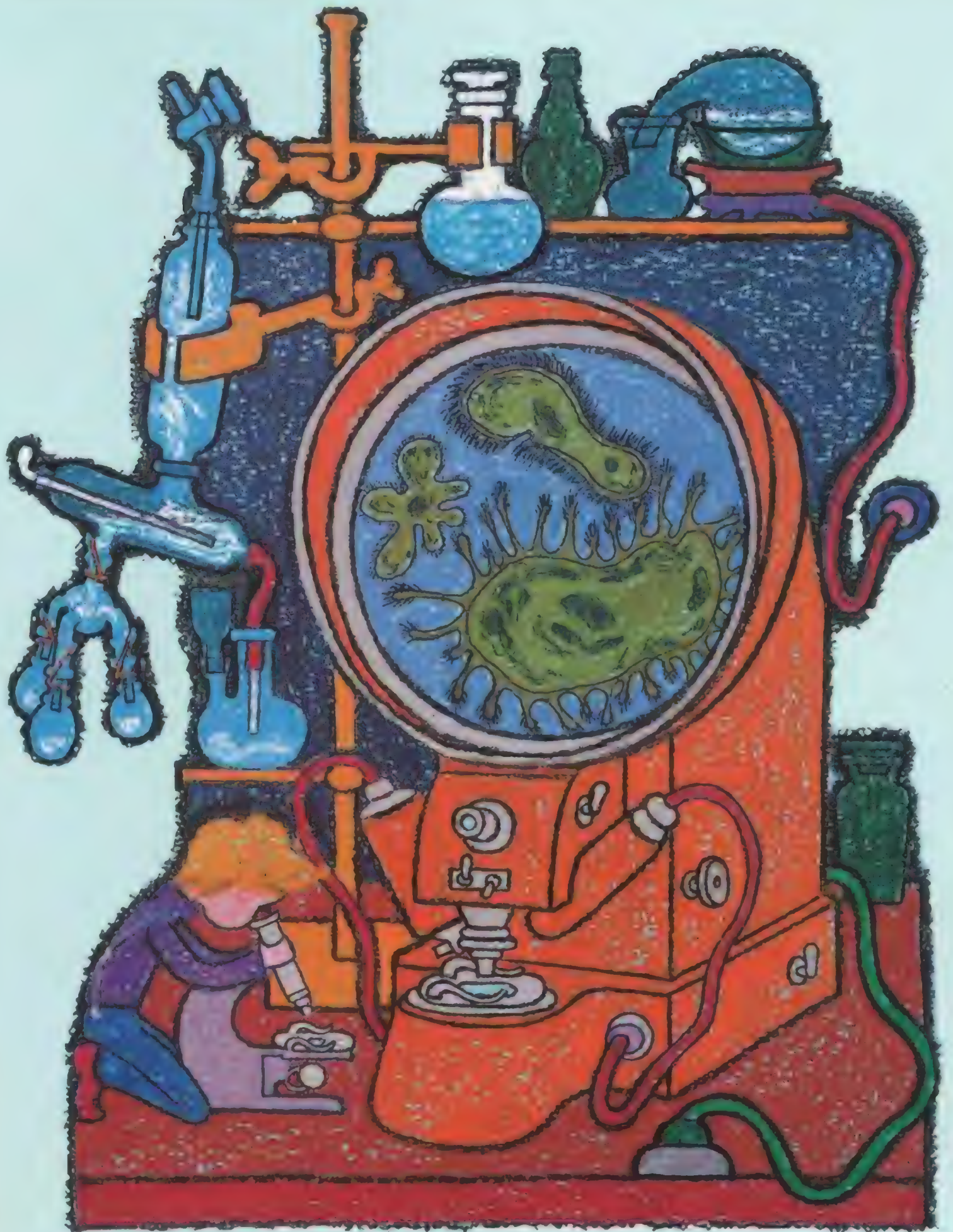
টেলিস্কোপ — সেও এই রকমের চোঙা বটে। তবে সেটা আরও বড় আর বেজায় ভারী। দূর হাতে ধরে রাখা যায় না। টেলিস্কোপ দেখতে কামানের মতন, আর কামানের মতোই টেলিস্কোপও খাড়া থাকে একটা মজবুত বেদির ওপর। তার ভেতরের কাচগুলোর ক্ষমতা এত বেশি যে আকাশে যে-সমস্ত তারা সামান্য মিটমিট করছে তাদেরও ভালোমতো দেখা যায়।

বড় হলে আমি দাদুর সঙ্গে মানমন্দিরে যাবই যাব। ওখানে টেলিস্কোপ আছে। আমি তখন সমস্ত তারা



ভানো করে দেখব। চাঁদের কথাও ভুলব না। দেখতে
পাব তার পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি আর চাঁদের শকনো
সাগর। কেননা এই দূরসন্ধানী টেলিস্কোপ দূরের সব
কিছু কাছের করে দেয়।





কেবল কেন আর কেন ?

সারা দিন ধরে আমি দাদুকে অতিষ্ঠ করে তুলি:
'বেড়াল কেন মিউমিউ করে? বাতাস কেন বয়?
আমার নাকের ওপর ছুঁলির দাগ কেন?'

কেবল কেন আর কেন।

দাদু অবাক হয়ে বলেন:

'তোর শূঁধুই কেন-কেন কেন রে?'

কেন যে আমার মূখ থেকে আপনা-আপনিই 'কেন'
বেরিয়ে আসে তা আমি নিজেই জানি না।

এই যেমন আজকে। দাদু বললেন: 'চশমা।' আর
আমি সেই আমার ধারায়: 'চশমা কেন বলা হয়?'

'বলা হয় এই জন্যে যে চশমা পরা হয় চোখে, আর
'চশম' মানে হল চোখ। চশম, চশমা — মিল আছে,
তাই না?'

দাদু বললেন:

'আজ চল, আমরা দুজনে ইউরার ইস্কুলে যাই।'
'ইস্কুলে কেন?'

'কেন না তোর গুণধর দাদাটি আবার বাজে নম্বর
পেয়েছে।'

ইস্কুলে ক্লাস ছাটির পর দাদু যতক্ষণ ইউরার
দিদিমণির সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন ততক্ষণে আমি
ধীরেসুস্থে ক্লাসের ঘরগুলো উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতে
লাগলাম। একটা ঘরে দেখতে পেলাম টেবিলের ওপর
রাখা বেদির ওপর কী রকম যেন একটা চোঙ।

ইউরার দিদিমণির সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর দাদু
বেজার হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসতে আমি আবার
কেন-কেন শূঁধু করে দিলাম:

'বেদির ওপর ঐ চোঙটা কেন?'

'ওটা বেদির ওপর চোঙা নয়, মাইক্রোস্কোপ —
অনুবীক্ষণ,' দাদু সঙ্গে সঙ্গে আঁচ করতে পেরে বললেন।
'ওতে সমস্ত ছোট ছোট জিনিস বড় দেখায়। এমন কি
যা খালি চোখে অদৃশ্য, তাও চোখে পড়ে। চাস ত
দেখাই তোকে।'

চাই না আবার! ইউরার দিদিমণির অনুমতি নিয়ে
আমরা ক্লাসঘরে ঢুকলাম মাইক্রোস্কোপ দেখতে।

মাইক্রোস্কোপ — দেখার একটা ছোট চোঙ। সেটা

বসানো আছে একটা বেদির ওপর। আর ছোট্ট একটা
টেবিলের মাঝখানে আছে ফুটো। মাইক্রোস্কোপ তার
চোখ নামিয়ে সেই দিকে দেখে। মাইক্রোস্কোপের সামনের
এই ছোট্ট টেবিলটার নীচে আছে একটা গোল আয়না।

দাদু লম্বা আকারের এক টুকরো পাতলা কাচ খুঁজে
বার করলেন। পাশের একটা বোতল থেকে তার ওপর
এক ফোঁটা জল ফেলে কাচের টুকরোটাকে এমন ভাবে
ছোট টেবিলটার ওপর রাখলেন যাতে জলের ফোঁটা
ফুটোটোর ঠিক ওপরে আসে। তারপর নিজের একটা
চোখ চোঙার ওপরকার মূখে ঠেকিয়ে গোল আয়নাটাকে
এদিক ওদিক ঘোরাতে লাগলেন।

'আয়নাটাকে ঘোরাচ্ছ কেন?' আবার আমার সেই
এক কথা।

'গোল আলোটা যাতে জলের ফোঁটার ওপর এসে
পড়ে। নইলে কিছুই দেখা যাবে না। হুঁ-হুঁ! এই ত
দ্রিষ্য হয়েছে। আচ্ছা, এবারে ফোঁটাটার দিকে চেয়ে
দ্যাখ দেখি। না, না, আগে খালি চোখে দ্যাখ।'

আমি চেয়ে দেখলাম — অসাধারণ কিছুই নজরে
পড়ল না। জলের ফোঁটা সাধারণত যেমন হয়ে থাকে,
তেমনি ফোঁটা।

কিন্তু ছোট্ট জিনিসকে বড় করে দেখার যন্ত্র
মাইক্রোস্কোপের ভেতর দিয়ে তার দিকে চাইতেই
রীতিমতো ভড়কে গেলাম। কোথায় গেল জলের ফোঁটা?
তার জায়গায় এ যে দেখছি সমুদ্র, আর সেখানে ভাসছে
কেমন যেন সব ভয়ংকর ভয়ংকর, শূঁড়ুওয়ালা, লোমশ
জীব।

শূঁড়ুওয়ালাগুলো হল এক ধরনের এককোষী কীট।
ওরা দেখতেই ভয়ংকর, আসলে কিছু লোকের পক্ষে
ক্ষতিকর নয়। হ্যাঁ, অদৃশ্য জীবগণ হল আলাদা
ব্যাপার, তারা প্রায়ই মানুষের ক্ষতি করে। জল না
ফুটিয়ে খেলে এই জীবগণগুলো পেটে যেতে পারে, আর
তাতে অসুখ করতে পারে।

...দাদুর সঙ্গে বাড়ি যেতে যেতে মাইক্রোস্কোপ আর
জীবগণের ব্যাপার আমার মাথা থেকে গেল না। তারপর
আমি ভাবতে লাগলাম ইউরার কথা। আচ্ছা এমনও ত





হতে পারে যে ইউরার পড়াশুনা খারাপ করার কারণ
এই যে 'দুই কোষী জীবগণ' ওর পেটে গেছে? আচ্ছা
ইউরাকে ভালোমতো মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখলে কেমন
হয়? আর এই জীবগণগুলো যদি ওর ভেতরে পাওয়া
যায়, তবে ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেই ত চলে?

আমি দাদাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।

দাদা তাতে হেসে বললেন:

আমাদের ইউরা কি জলের ফোঁটা, না ফুলের
পাপড়ি, নাকি মাছের পা, না সবুজ পাতা? না,
মানুষকে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যায়
না। তবে হ্যাঁ, ইউরার চুল, নখ কিংবা ওর আঙ্গুল থেকে
এক ফোঁটা রক্ত নিয়ে যদি মাইক্রোস্কোপের ভেতর দিয়ে
দেখা হয় তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। তবে
মাইক্রোস্কোপ ছাড়াই বোঝা যাচ্ছে ইউরার ভেতরে
'দুই কোষী জীবগণ' বাসা বেঁধেছে। ও কিছ, না,
সারিয়ে তোলা যাবে।"

১. অনুবীক্ষণযন্ত্রের সঙ্গে ফোঁটা পিতলের পায়রা ওপর
তোলায় ব্যবস্থা। (অনুবীক্ষণ যন্ত্রের চয়িশের দশক)।
২. উনবিংশ শতাব্দীর সোড়ার শিককার
অনুবীক্ষণযন্ত্র। উনবিংশ শতাব্দীর
বিখ্যাত প্রকৃতিবিদ কাল মাক্স
বায়েরের সম্পত্তি।
৩. ইউরার গর্ভবেতকের জন্য
অনুবীক্ষণযন্ত্র।
৪. কবীন্দ্রের অনুবীক্ষণ।
৫. উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম
অনুবীক্ষণযন্ত্র (অনুবীক্ষণ যন্ত্রের
চয়িশের দশক)।
৬. প্রথম আলোর একটি সোজিয়েড
অনুবীক্ষণযন্ত্র — হবি মাক্স
অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দশক।
৭. উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম
অনুবীক্ষণযন্ত্র, তিন দিকে ঘোরানো
যায়।
৮. বিশেষ উদ্দেশ্যে তৈরি একটি পরকলা
(উনবিংশ শতাব্দীর দশকের দশক)।





কাউকে ডরাই না !

বাবা আমাকে জন্মদিনে যে বইটি উপহার দিয়েছিলেন তাতে ছিল কাঠের তৈরি খোকা বুরাতিনো, ও তার বন্ধুরা — মালভিনা, পিয়েরো আর আর্তেমেন নামে একটা কুকুর; এ ছাড়া ছিল তাদের শত্রু কারাবাস-বারাবাস, আলিসা খে'কশিয়ালী ও বাজিলিও হুলো বেড়াল।

আগে আমি ওদের সকলকে জানতাম কেবল ছবিতে। কিন্তু একদিন আমি ওদের দেখতে পেলাম জলজ্যান্ড — মোটেই ছবির নয়।

এই ঘটনা ঘটল, যখন দাদুর সঙ্গে আমি থিয়েটারে গেলাম।

আমাদের জায়গাটা পড়ল বাজে — থিয়েটার হল-এর শেষে, পেছনের দেয়াল ঘেঁষে। দর্শকরা বুরাতিনোর কীর্তিকান্ড দেখে আনন্দ পাচ্ছে, পাজী কারাবাস-বারাবাসের ওপর ক্ষেপে যাচ্ছে, এদিকে আমি বসে বসে চোখ পিটিপটি করছি। অন্য ছেলেমেয়েরা সব কিছু দিবি দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আমার তখন কাঁদো কাঁদো অবস্থা — মণ্ডে কী হচ্ছে না হচ্ছে দূর থেকে তার মাথামুণ্ডু বোঝার উপায় নেই।

ভাগ্য ভালো বলতে হবে যে দাদুর চশমা কাজে এলো। দুই ডান্ডা জোড়া অর্মান চশমা নয়, বাইনোকুলর-চশমা।

এ হল খাটো খাটো দুটো চোঙ, একসঙ্গে আঁটা। এতেও কাচ আছে। এক দিকের কাচ ছোট, উল্টো দিকের — বড়।

প্রথমে দাদু নিজে বাইনোকুলর দিয়ে দেখলেন, তারপর আমাকে দিলেন। আমি দারুণ খুশি হলাম, চোখ বড় বড় করে ছোট ছোট কাচের ভেতর দিয়ে তাকাই, ...কিন্তুই দেখতে পাই না। কোথায় বুরাতিনো, কোথায়ই বা মালভিনা!.. আমার সামনে কেমন যেন লেপা পোঁছা দুটো গোল জায়গা আর তার ভেতরে কী যেন নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু ঠিক যে কী তা বোঝার উপায় নেই।

দাদু লক্ষ করলেন আমি উসখুস করছি,

বাইনোকুলর কিছুতেই বাগে আনতে পারছি না। তা দেখে দাদু ফিসফিস করে বললেন:

‘দুই চোঙের মাঝখানের স্কুটা ঘোরা, ভালো দেখতে পারি।’

আর সত্যিই তাই, সঙ্গে সঙ্গে দুটো গোল মিলে একটা হয়ে গেল — তার ভেতর দিয়ে আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম বুরাতিনোকে। দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন একেবারে পাশে।

কিন্তু এ আনন্দ বেশিক্ষণ টিকল না। হঠাৎ বাইনোকুলরের ভেতর থেকে আমার দিকে কটমট করে তাকাতে থাকে কারাবাস-বারাবাসের ঝুপঝুপে দাড়িগোঁফে ঢাকা বিদঘুটে, ইয়া নাকওয়ালা বাঁকা বদনখানা। আমি এই বিকট চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেলাম, সঙ্গে সঙ্গে চোখ বৃজে ফেললাম।

‘তোমার বাইনোকুলরে কাজ নেই দাদু। আমার ভয় করছে।’

‘আচ্ছা তুই কারাবাস-বারাবাসকে দ্যাখ বাইনোকুলরের উল্টো দিক দিয়ে — যেখানে কাচগুলো বড় বড়।’

আমি দাদুর পরামর্শ শুনলাম, পাজীটা তৎক্ষণাৎ আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেল, হয়ে গেল ছোট্ট, তখন আর তাকে মোটেই ভয়ংকর লাগল না।

এই ভাবে আমি সর্বক্ষণ বাইনোকুলর ঘুরাতে লাগলাম। বুরাতিনো, মালভিনা আর কুকুর আর্তেমেন, মানে রাজ্যের ভালোদের দেখি ‘কাছের’ ছোট ছোট কাচ দিয়ে, আর যারা খারাপ — এই যেমন, কারাবাস-বারাবাস, খে'কশিয়ালী আলিসা আর হুলো বেড়াল বাজিলিও — এদের সবাইকে দেখি ‘দূরের’ বড় বড় কাচ দিয়ে।

দাদু ত হেসেই কুটিপাটি। বললেন, ‘ভালো ফন্দি বার করেছিস বটে!’ আর ঠিক সে সময় থেকে, আমি কোন অপরাধ করলেই দাদু তাঁর বাইনোকুলর নিয়ে শাস্তি হিশেবে আমাকে ‘খারাপ’ কাচ দিয়ে দেখেন।

খানিকক্ষণ সহ্য করার পর আমি শেষকালে বলে ফেলি: ‘রাগ করো না দাদু! আমি আর করব না। ‘ভালো’ কাচ দিয়ে আমাকে দেখ!’



কোন চশমা ভালো ?

দাদুর পুরনো অ্যালবামে আমি দেখতে পেলাম এক ডাকসাইটে নাবিকের ফোটো। লোকটার মাথায় সোনালি রঙের নোঙ্গর আঁকা কালো টুপি, টুপির কিনারা সাদা। তার পোশাকের কাঁধে তারা বসানো কাঁধপটি, হাতায় — ফিতে। তার সারা বুক জুড়ে যুদ্ধের পদক।

‘এটা কে?’ দাদুকে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

‘নাও, বোঝ কাণ্ড, নিজের দাদুকেই চিনতে পারলি না!’

তাকিয়ে দেখি — সঁতাই তা, দাদু। তবে, এখনকার মতো বড়ো নয়, অল্পবয়সী। আর তার গোর্ফও কালো কুচকুচে, সাদা নয়। চোখজোড়ায় খুঁশি করে পড়ছে, চোখের চারপাশের চামড়া তখনও কোঁচকায় নি — এ চোখও তারই। দাদুর ছবিটা তোলা হয়েছে একটা কেমন যেন উঁচু চোঙের পাশে।

‘চোঙ কেন?’

‘কেন মানে! এটাও যে আমার চশমা। ফাশিস্তদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় এটা আমাকে চমৎকার কাজ দিয়েছিল। আমি তখন ছিলাম নাবিক — ডুবোজাহাজের নাবিক।’

আমি দাদুকে ধরে বসলাম: ‘বল, বল।’ দাদু তখন বললেন।

ডুবোজাহাজ নাম হয়েছে এই কারণে যে এ জাহাজ মাছের মতো জলের নীচে সাঁতার দিতে পারে।

অন্য সব যুদ্ধজাহাজ — ক্রুজার বল, ব্যাটলশিপ বল আর ডেস্ট্রয়ারই বল — তারা জলের ওপর দিয়ে চলে মাত্র, গভীরে কক্ষনো নয়। কিন্তু এই জাহাজটা ওপরে কদাচিৎ আসে। বেশির ভাগ সময়ই কাটায় মাছের রাজ্যে। দরকার হলে পড়ে থাকবে একেবারে জলের নীচে ধীরস্থির স্বভাবের তারামাছ আর কাঁকড়াদের পাশাপাশি, যতক্ষণ না ওপরে ভেসে ওঠার হুকুম পাচ্ছে।

ডুবোজাহাজ যখন সমুদ্রের ভেতরে ডুব দেয় তখন তাকে কেউ দেখতে পায় না, অথচ সে সকলকে দেখতে পায়।

ডুবো চশমা — এই ডুবো চশমাই হল ডুবোজাহাজের চোখ। তার আসল নাম — পেরিস্কোপ।

পেরিস্কোপ হল দেখার লম্বা চোঙ। নৌকো যখন জলের নীচে তখন তার দেখার চোঙের আগাটা জলের ওপরে জেগে থাকে, সে তার কাচের চোখ দিয়ে চারপাশের সব কিছু লক্ষ করে। আর চতুর্দিক সন্ধানী পেরিস্কোপ যা লক্ষ করে তা ডুবোজাহাজের নাবিকও যে দেখে তা আর বলতে! নাবিক নীচ থেকে চোঙের ভেতর দিয়ে দেখে।

এই রকমই এক ডুবোজাহাজে আমার দাদুও ঘুরেছেন, তিনিও এই রকমই ডুবো চশমা দিয়ে দেখেছেন।

এক দিন দাদুদের ডুবোজাহাজ ফাশিস্তদের কুজার খুঁজে বার করে ধ্বংস করার হুকুম পেল। আমাদের নাবিকেরা অনেক দিন হল এই ডাকাতিটার পিছু নিয়েছিল।

ভোরের দিকে সমুদ্রে এসে পড়ল। দাদু পেরিস্কোপের ওপর ঝুঁকে পড়লেন, পেরিস্কোপের চোঙ এদিক ওদিক ঘোরালেন। ফাঁকা সমুদ্র। ঢেউয়ের সাদা সাদা ফেনা ছাড়া চারপাশে আর কিছুই নেই।

পর দিন দুপুরে, অনেক দুপুরে, আকাশ যেখানে মাটির সঙ্গে এসে মিলেছে, সেখানে স্পষ্টে একটা বিন্দুমতো দেখা গেল। কাছে, আরও কাছে এগিয়ে এলো বিন্দুটা — সেটা পরিণত হল শত্রুপক্ষের বিশাল কুজারে। কুজারের গায়ে মোটা বর্ম — যে কোন গোলায় ভয়ংকর কামান।

‘হুঁ হুঁ, ফাশিস্ত বাছাধন ধরা পড়েছে! এই বারে যাবে কোথায়!’ দাদু মনে মনে ভাবলেন, তিনি দস্যুটাকে ডুবিয়ে দেবার নির্দেশ দিলেন।

এদিকে নিজে কুজারটার ওপর নজর রাখলেন। দেখতে পেলেন সরু নাকওয়ালা টর্পেডোর মাইন জলের নীচ দিয়ে লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলল। ওটা ক্রমেই শত্রুপক্ষের কুজারের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই বার! প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ হল, জাহাজ কালো-লাল ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল, একটা বাদামের মতো কটাস করে





ভেঙ্গে দ্দু আধখানা হয়ে গিয়ে ডুবতে লাগল।

‘এটা হল সেই দস্যুটাকে ডুবিয়ে দেবার স্মৃতিচিহ্ন,’
দাদু শেষকালে বললেন।

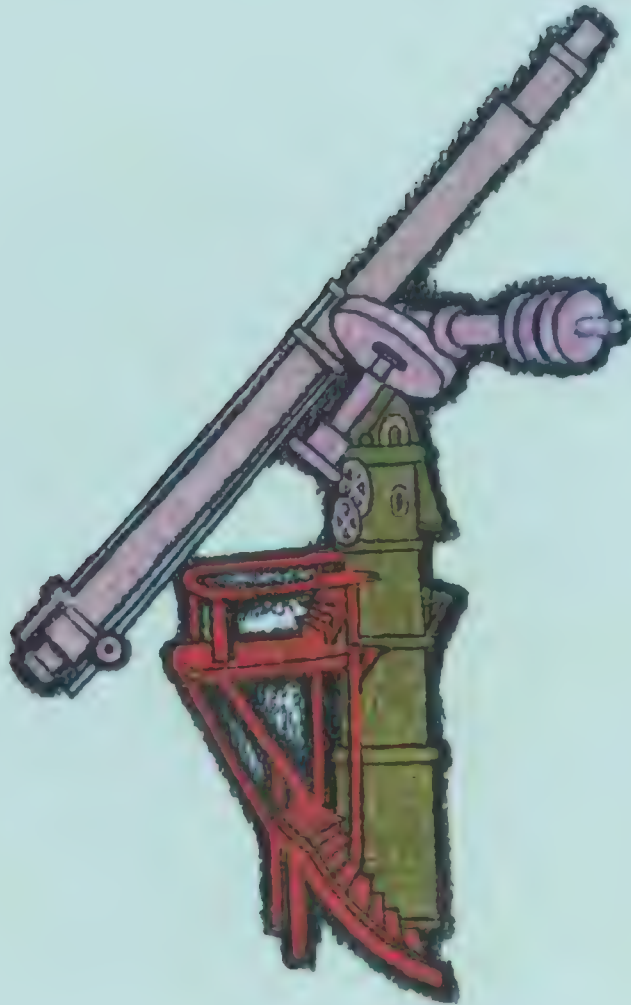
এই কথার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর পুরনো ফোটোটা
হাতে নিয়ে অম্যান্য পদকের সঙ্গে যে বড় তারাটা তাঁর
বুকের ওপর শোভা বর্ধন করছিল সেটা দেখিয়ে
দিলেন।

...আয়নাস্কোপ-পেরিস্কোপ আমার বেশ ভালো
লাগল! বড় হলে দাদুর মতো আমিও আয়নাস্কোপ-
পেরিস্কোপ দিয়ে শত্রুর ওপর চুপি চুপি নজর রাখব।

না, তার চেয়ে বরং দূরবীন-টেলিস্কোপ দিয়ে
দূরের তারা দেখব।

নাকি অনুবীক্ষণ-মাইক্রোস্কোপ দিয়ে অদৃশ্য জীবাদ
খুঁজব।

না, কী ধরনের চশমা যে নেওয়া যায় ভেবে কূল
পাচ্ছি না!





Г. Юрмин
ДЕДУШКИНЫ ОЧКИ
На языке бенгали

G. Yurmin
GRANDPA'S GLASSES
In Bengali

ছবি একেছেন হৈরিনা কিসেলেড্‌কায়া
মূল রূপ থেকে অনুবাদ: অরূপ সোম
ছোট শিশুদের জন্য

© বাংলা অনুবাদ . সচিত্র . 'রাঙ্গা' প্রকাশন . ১৯৮৪
সোর্ভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

Перевод сделан по книге:
Г. Юрмин. Дедушкины очки.
М., «Малыш», 1972 г.

Ю 4803010102—011 275—83
031(01)—84

ИБ № 701

Редактор русского текста М.Е. Шумская
Контрольный редактор Н.П. Ефанова
Художник И.В. Киселевская
Художественный редактор Т.В. Иващенко
Технические редакторы Г.Б. Кочеткова, А.П. Агафошина
Корректор Н.А. Антонова

Сдано в набор 11.12.82. Подписано в печать 09.02.84
Формат 60х90/8. Бумага мелованная. Гарнитура бенгали
Печать офсетная. Условн. печ. л. 3,0. Усл. кр.-отт. 20,5
Уч.-изд. л. 5,49. Тираж 20 090 экз. Заказ № 00669
Цена 91 к. Изд. № 35136

Издательство „Радуга“ Государственного комитета
СССР по делам издательства, полиграфии и книжной
торговли.
Москва, 119859, Zubovskiy bulvar, 17

Типография А/О Фини́рсклама, Сулкава, Финляндия



